গড়পার

আমাদের ছেলেবেলায় এমন অনেক কিছু ছিল যা এখন আর নেই। বাড়ির বারান্দার রেলিং থেকে To Let লেখা বোর্ড ঝুলতে এখন আর কেউ দেখে কি ? তখন পাড়ায় পাড়ায় দেখা যেত। ছেলেবেলায় দেখেছি ওয়ালফোর্ড কোম্পানির লাল ডবল ডেকার বাসের ওপরে ছাত নেই। সে বাসের দোতলায় চড়ে হাওয়া খেতে খেতে যাওয়ার একটা আলাদা মজা ছিল। রাস্তাঘাট তখন অনেক নিরিবিলি ছিল, ট্র্যাফিক জ্যামের বিভীষিকা ছিল না বললেই চলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় তফাত ছিল মোটর গাড়ির চেহারায়। কত দেশের কত রকম মোটরগাড়ি যে চলত কলকাতা শহরে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব গাড়ির প্রত্যেকটার চেহারা এবং হর্নের আওয়াজ আলাদা। ঘরে বসে হর্ন শুনে গাড়ি চেনা যেত। ফোর্ড শেভ হাম্বার ভক্সহল উল্‌স্‌লি ডজ ব্যুইক অস্টিন স্টুডিবেকার মরিস ওল্‌ডসমোবিল ওপ্যাল সিত্রোয়াঁ—এসব গাড়ি এখন শহর থেকে লোপ পেয়ে গেছে। হুড খোলা গাড়ি ক'টা দেখা যায়। খুদে গাড়ি বেবি অস্টিন কালেভদ্রে এক-আধটা চোখে পড়ে। আর সাপের মুখওয়ালা 'বোয়া হর্ন' লাগানো বিশাল ল্যানসিয়া, লাসাল—এসব আমীরী গাড়ি তো মনে হয় স্বপ্নে দেখা। কচ্ছপের খোলের মতো দেখতে প্রথম স্ট্রীমলাইন্‌ড গাড়ি যখন কলকাতায় এলো, সেও তো প্রায় এক যুগ আগে। আর ঘোড়ার গাড়ি জিনিসটাও প্রায় দেখাই যায় না। আমাদের গড়পারের বাড়িতে মোটরগাড়ি ছিল না, তাই ঘোড়ার গাড়িতে আমরা অনেক চড়েছি। বাক্সগাড়িতে আরাম কোনো দিনই ছিল না, তবে ফীটনে চড়ে বেশ মজা লাগত এটা মনে আছে।

আজকাল আকাশ কাঁপিয়ে জেট প্লেন যাতায়াত করে শহরের উপর দিয়ে। তখন এ শব্দটা ছিল মানুষের অচেনা। দুটো একটা টু সীটার প্লেন আকাশে দেখা যেত মাঝে মধ্যে। তখন দমদম আর বেহালায় ফ্লাইং ক্লাব চালু হয়েছে, বাঙালীরা প্লেন চালাতে শিখছে। এই সব প্লেন থেকে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের কাগজ ফেলা হত। হাজার হাজার কাগজ এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে সেগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শহরের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত। একবার খানকতক পড়ল আমাদের বকুলবাগানের বাড়ির ছাতে ; তুলে দেখি বাটার বিজ্ঞাপন।

দৈনিক ব্যবহারের জিনিস, ওষুধপত্র ইত্যাদি যে কত বদলেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নাইলনের আগের যুগের সাদা রঙের কলিনোজ টুথব্রাশ আজকাল আর কেউ ব্যবহার করে না। আমরা তাই করতাম, আর সেই সঙ্গে কলিনোজ টুথপেস্ট। কালো রঙের Swan আর Waterman ফাউন্টেন পেন

যা দিয়ে তৈরি হত তাকে বলত Gutta Percha। পুড়লে বিশ্রী গন্ধ বেরোত। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে সেসব কলম আজকের দিনের কলমের চেয়ে ঢের বেশি টেকসই ছিল।

কোয়ালিটি-ফ্যারিনির যুগে বাড়িতে Freezer দিয়ে আইসক্রীম আর কে তৈরি করে? আমাদের ছেলেবেলায় কাঠের বালতির গায়ে লাগানো লোহার হাতলের ঘড় ঘড় শব্দ শুনলে মনটা নেচে উঠত। কারণ বাড়ির তৈরি ভ্যানিলা আইসক্রীমের স্বাদের সঙ্গে কোনো ঠেলাগাড়ির আইসক্রীমের স্বাদের তুলনা চলে না।

মনে আছে ছেলেবেলায় অসুখ করলে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিতেন, আর সেই প্রেসক্রিপশনে দেখে মিক্সচারের শিশি দিয়ে দিত ডাক্তারখানা থেকে। সবচেয়ে মজা লাগত শিশির গায়ে আঠা দিয়ে লাগানো দাগ কাটা কাগজের ফিতে। এ জিনিস আজকাল প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। সেকালে সর্দি হলে ফুট বাথ নিতে হত। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে গামলায় গরম জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে হত। তাতে সর্দি সারত কিনা সেটা অবিশ্যি মনে নেই। জোলাপের জন্য তখন খেতে হত Castor Oil—যার স্বাদে গন্ধে নাড়ীভুঁড়ি উলটে আসত। ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনীনের বড়ি ছাড়া গতি ছিল না। আমি আবার বড়ি গিলতে পারতাম না। একবার ঢাকা যাবো, সেখানে ম্যালেরিয়া, কুইনীন খেতে হবে। চিবিয়ে খেয়েছিলাম সেই বড়ি। তার বিষ তেতো স্বাদ এখনো যেন যায়নি মুখ থেকে। ক্যাপসুল আসার পর থেকে ওষুধ জিনিসটা যে বিস্বাদ হতে পারে সেটা ভুলে গেছি আমরা।

একেবারে শিশু বয়সের কথা মানুষের খুব বেশি দিন মনে থাকে না। আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স আড়াই বছর। সে ঘটনা আমার মনে নেই। কিন্তু বাবা যখন অসুস্থ, আর আমার বয়স দুই কিম্বা তারও কম, তখনকার দুটো ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

বাবা অসুখে পড়েন আমি জন্মাবার কিছুদিনের মধ্যেই। এ অসুখ আর সারেনি, তবে মাঝে মাঝে একটু সুস্থ বোধ করলে বাবাকে বাইরে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হত। বাবার সঙ্গেই আমি গিয়েছিলাম একবার সোদপুর আর একবার গিরিডি। গঙ্গার উপর সোদপুরের বাড়ির উঠোনটা মনে আছে। একদিন বাবা ছবি আঁকছেন ঘরে জানালার ধারে বসে, এমন সময় হঠাৎ বললেন, 'জাহাজ যাচ্ছে।' আমি দৌড়ে উঠোনে বেরিয়ে এসে দেখলাম ভোঁ বাজিয়ে একটা স্টীমার চলে গেল।

গিরিডির ঘটনায় বাবা নেই; আছে আমাদের বুড়ো চাকর প্রয়াগ। আমি আর প্রয়াগ সন্ধ্যাবেলা উশ্রীর ধারে বালিতে বসে আছি। প্রয়াগ বলল, বালি খুঁড়লে

জল বেরোয়। আমি ভীষণ উৎসাহে বালি খুঁড়তে শুরু করলাম। খোঁড়ার জন্য খেলনার দোকানে কেনা কাঠের খোন্তা ছিল, সেটাও মনে আছে। খোঁড়ার ফলে জল বেরিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সময় কোত্থেকে একটা দেহাতি মেয়ে এসে সেই জলে হাত ধুয়ে গেল। যে জল আমরা খুঁড়ে বার করেছি তাতে অন্য লোক এসে হাত খুয়ে যাবে এটা ভেবে একটু রাগ হয়েছিল, তাও মনে আছে।

যে বাড়িতে আমার জন্ম, সেই একশো নম্বর গড়পার রোডে আমি ছিলাম আমার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর অনেক বাড়িতে থেকেছি, আর সবই দক্ষিণ কলকাতায় ; কিন্তু গড়পার রোডের মতো এমন একটা অদ্ভুত বাড়িতে আর কখনো থাকিনি।

শুধু তো বাড়ি নয়, বাড়ির সঙ্গে আবার ছাপাখানা। ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রকিশোর নিজে নকশা করে বাড়িটা তৈরি করে তাতে থাকতে পেরেছিলেন মাত্র বছর চারেক। তিনি মারা যান আমার জন্মের সাড়ে পাঁচ বছর আগে। বাড়ির সামনে দেয়ালে উপর দিকে উঁচু উঁচু ইংরিজি হরফে লেখা ছিল 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্‌স, প্রিন্টার্‌স অ্যান্ড ব্লক মেকার্‌স।' গেট দিয়ে ঢুকে দারোয়ান হনুমান মিসিরের ঘর পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে ছিল ছাপাখানার আপিসে ঢোকার বিরাট দরজা। এক তলায় সামনের দিকটায় ছাপাখানা, আর তার ঠিক উপরে দোতলায় ছিল ব্লক তৈরি আর হরফ বসানোর ঘর। আমরা থাকতাম বাড়ির পিছন দিকটায়। বাঁয়ে গলি দিয়ে গিয়ে ডাইনে পড়ত বসতবাড়িতে ঢোকার দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকেই সিঁড়ি। আত্মীয়স্বজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাইনে ঘুরতেন, আর ছাপার কাজের ব্যাপারে যাঁরা আসতেন তাঁরা ঘুরতেন বাঁয়ে। বাঁয়ে ঘুরে ব্লক-মেকিং ডিপার্টমেন্টের দরজা, আর ডাইনে ঘুরে আমাদের বৈঠকখানার দরজা।